একটি সুর ও আমরা

– সাধন সরকার

একটা সুর, ভুলে যাওয়া প্রায় এই সুরের ধ্বনি অনেকদিন পর শুনলো শ্রবণ। পঁচিশ বছর আগে ছেলেবেলায় শোনা এই সুরের সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। আকাশ বেশ কয়েকদিন গোমরামুখো থেকে, আজ ক'দিন হ'ল হাসছে। রাজ সড়কের দু'পাশে এতোদিন কোন পাতানো দোকান বসেনি, উপায় ছিল না। প্রচন্ড বর্ষনে ড্রেনের দু'কুল ছাপিয়ে রাস্তা ভেসে গিয়েছিল, আজ বেশ কয়েকটি দোকান বসেছে, একটা ঝুড়িতে করে পেয়ারা বেচ্ছে একজন, তার পাশে ডাবের দোকান দিয়ে বসেছে কেউ, তারপরেই পাশাপাশি মুচির দোকান, ছেঁড়া জুতো সারানো, রং করা আর সঙ্গে আছে রঙ্গিন ডালা-কুলো, ছেলেপেলেদের খেলার ঝুড়ি। তার একটু দূরে রিক্সা ও সাইকেলের টায়ার-টিউব সারানো, পাম্প দিয়ে দেওয়া, সলিউশন লাগিয়ে টিউবে তালি দিয়ে দেওয়া, স্পোক লাগানো, টাল ঠিক করা প্রভৃতি কাজের জন্য এক দোকান। ঠিক দোকান বলতে আমাদের চোখের সামনে যা ভাসে এ তা নয়। রাস্তার পাশে ঘাসে ভরা জমিটুকুর উপর একটা চট কিংবা ছালা পেতে বসে পড়া।

খোলা আকাশের নীচে বসে এভাবেই রুজি রোজগারের চেষ্টা করে ওরা। আজ আকাশ প্রসন্ন, সূর্যটা অনেকদিন পর প্রাণ খোলা হাসি হাসছে। গোমড়ামুখো মেঘ তারাও কাল ঘুচিয়ে সাদা হয়েছে। নীল আকাশে খন্ড খন্ড সাদা শরতের প্রকাশ। ঠিক এই সময়েই সুরটা শ্রবণকে আনমনা করে দিল। সময়? তখন আর কত হবে। দিবা দ্বিতীয় প্রহর শুরু হয়েছে। বেশ চওড়া দোতলা ঘরে বসে আক্ষেপ করে বলছিলেন প্রধান পরিচালক। শুনছিল সবাই, তিনি বলছিলেন, 'কি করবো বলো। স্কুল অব মিউজিকের ব্যাপারটাই এখনো পর্যন্ত কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না কাউকে। সকলেই ভাবে এটা একটা গানের ইস্কুল। সব শাখাগুলো যদি পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করতো, তবে আর ভাবনা ছিল না কোন'। ঘরে পাখা ঘুরছে। কয়েকটা তানপুরা, তবলা, হারমোনিয়াম, সতরঞ্চি পাতা। আজ এ বেলায় ছেলেরা আসবে না, আসবে ওবেলায়। সুতরাং এই সময়টুকু বসে গান গাও, গল্প কর যা ইচ্ছা। তাই প্রধান পরিচালক ও তার পার্ষদরা মিলে বসে স্কুল অব মিউজিক সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। ঠিক এই সময়েই তীক্ষ্ম নাকি সুরটা, বাতাসে ভর করে, উজ্জল রৌদ্রের রেণু গায়ে নিয়ে ভেসে এল।

সুরটা বেশ চেনা মনে হচ্ছে। জৌন্পুরী না? বললেন প্রধান। .....কে? বাজাচ্ছে কে? পার্ষদ একজন উঠে বারান্দায় এল। এই ঝুল বারান্দা থেকে রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। রাস্তার পাশে একটা মুচীর দোকানে বসে বাজাচ্ছিল লোকটা। পার্ষদ বারান্দায় দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে বলল, –'এক বুড়ো সানাই বাজাচ্ছে'।

স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া শ্রবণ চিৎকার শুনে সম্বিত পেল, বলল– ডাক না এখানে, প্রধানও সায় দিলেন বেশতো ডাক..... ।

পার্ষদ আবার চিৎকার করে ডাক দিল– এই – এই যে – ওপরে এসোতো। ওপাশ দিয়ে যাও। ঘরে ঢুকে বসতে বসতে বলল –ভীড় জমিয়ে নিয়েছে বুড়ো। এই সানাই এখন আর বেশী শোনা যায় না। পাকিস্তানের পর এর রেওয়াজ উঠেই গিয়েছিল। মুসলমানদের বিয়েতেতো বাজনার দরকার হয় না। বরের ধুম ধাম পট্কার শব্দের মধ্যে অথবা বন্দুকের গুলির শব্দ করতে করতে বীর বেশে প্রবেশ, বীরোচিত বিয়েতে করুণ সানাই এর স্থান নেই। এটা ছিল হিন্দুদের রেওয়াজ। বিয়েতে, পালা পার্বনে এর কদর ছিল। আর পৃষ্ঠপোষকতা করতো জমিদারেরা। সে প্রথারও অবলুপ্তি ঘটেছে। তারাও আর নেই; সুতরাং এর বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে না বললেই কি সমাধানের তৃপ্তিতে মন ভরে? শিল্পের দোষ কি? জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য এক কালে এর সমৃদ্ধি ছিল, এখন তারা নেই কিন্তু সাধারণ লোক শুনে তো তৃপ্তি পাচ্ছে। চিন্তায় বাধা পড়লো প্রধানের।

খন্ড দলটি সঙ্গে নিয়েই সানাইদার প্রবেশ করলো। পরনে পুরনো আধময়লা লুঙ্গি, খালি গা, পা-ও খালি, কাদা মাখা। হাতে সানাই। চোখে ভাল দেখতে পারে না বলে মুচি ভক্তদাস তাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

পার্ষদ আবার চিৎকার করে বললেন, –এই তোমরা বাইরে থাক। ঘরে কেউ ঢুকবে না– খন্ড দলটি থমকে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদেরও কারো গায়ে জামা নেই, ময়লা লুঙ্গি পরণে। ছোট ছোট ছেলের দল, ন্যাংটো, আখের টুকরো চুষছে। সর্তক পার্ষদ হাঁকলো –জালাল অফিস ঘরটা বন্ধ করে দিস্। প্রধান বললেন – আর চা দিয়ে যাস্। চা খাও তো?

তা দিলি খাতি পারি, বলল সানাইদার।

সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বৈকি! এই ক্ষুদে ছেলের দল যে কোন মূহুর্তে সুযোগ পেলেই টুক্ করে চুরি করে বসবে। তাদের ছোট ছোট চাওয়ার প্রয়োজন এইভাবে মিটাতে শিখেছে নিজেরা, কেউ শেখায়নি, পরিবেশ ও অর্থনীতির চাপে নিজেরাই শিখে নিয়েছে। ধরা পড়লে মার ধোর ছাড়া আর কি শাস্তি হবে। সুতরাং মার ধোর খেতে শেখ, কান্না মুছে ফেলতে শেখ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সাফাই এর হাতটাও পেকে উঠুক। বড় হতে হতে এদের সুকুমার বৃত্তিগুলির মৃত্যু ঘটবে। ঘাত প্রতিঘাতে বাঁচার চেষ্টায় জীবনের তিক্ত স্বাদের আস্বাদ ছাড়া জীবনের অন্য দিক অন্ধকারময় রয়ে যাবে। সকলের অবজ্ঞা,

আর লাথি ঝাঁটার ভেতর দিয়ে এদের যখন যৌবন আসবে তখন আশ্বিনের কুকুরের মত লালসা ঝরবে, কাম উত্তেজনার প্রশমনে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে হেন অপকর্ম নেই যা করতে এদের আটকাবে। ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ অমানুষ-নাগরিক হয়ে সমাজে অবস্থান করবে।

কিন্তু আজ বিস্ময় বোধের আনন্দটুকু এদের এখনও মরেনি। কবি হৃদয়টা এখনও সতেজ আছে বলেই ন্যাংটা হয়ে সানাই শুনতে এসেছে। কোন কুণ্ঠা নেই। একটি গাছ যদি ঘরের ভেতর রেখে দরজা জানালা আটকে আলোর পথ বন্ধ করে দেওয়া যায় তবে নিজেকে বাঁচাতে আলোর স্পর্শ পাওয়ার ব্যাকুলতায় বিকৃত হতেও তার আপত্তি থাকবে না। আসল কথা যেমন করেই হোক বাঁচতে হবে।

আর যদি মুক্ত পরিবেশে প্রচুর আলোর উত্তাপ বাতাস, নিয়মিত গ্রহণ করতে পারে তবে সে হবে সতেজ পুষ্ট, বলবান।

সানাইদার সানাইতে ফুঁদেবার আগে হারমোনিয়ামের একটা ঘাট দেখিয়ে বলল –এইডে একটু ধরেন দি, বাঁশিডা না মিললি আবার ভাল লাগবে নানে।

শুরু হল বাজনা। রাস্তায় যে সুরটা বাজাচ্ছিল সেটাই ধরল সে। চোখে মুখে খুশী আর উত্তেজনা, মুচী ভক্তদাস ঘরের ভেতরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছিল। পাটিতে বসতে সাহস হয়নি। বারান্দায় থমকে দাঁড়ানো খন্ড দলটিও চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। সানাইদার তখন গাল ফুলিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাজিয়ে চলেছে। চোখে মুখে খুশীর আমেজ। বোধ হয় অতীত দিনের কোন এক মূহুর্তের দৃশ্য তখন তার মনের পর্দায় ফুটে উঠেছে।

এমনি বাবুদের সামনে ফরমাইসি বাজনা বাজিয়েছে কত। ও তল্লাটে তখন পরান ঢুলী আর সে, মেডেল, টাকা, কাপড়-চোপড়, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে ফুটে থাকা অজস্র লোকের ডাগর ডাগর চোখ। তখন সে আর পরান ঢুলী যাদুগর, সুরের মোচড়ে মোচড়ে। ঢোলের বাজনার ঠমকে গমকে সমস্ত লোকজন মন্ত্র মুগ্ধ। মেজ কর্তাও। তিনি বললেন, –বাজাচ্ছতো ভাল, দিন কা বেহাগ জানো?

দিন কা বেহাগ? –গৌড় সারং –। হাত জোড় করে বলেছিল বিনয়ে –যদি আজ্ঞা দেন তো বাজাই।

বেশ বাজাও দেখি, শুনি।

সেও এমনি বৈঠকি আসর, প্রাণ ঢেলে বাজানোর পুরস্কারও মিলল সেদিন। নায়েব মশাই এসে বললেন –এই যে, এই নাও। মেজ কর্তা দিলেন। দুটো মেডেল। সোনার, ঝক্ ঝক্ করছে। সেদিন হৃৎপিন্ডটা যেন ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল আনন্দে। তার একটু পরেই চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল। যখন নায়েব মশাই বললেন, মোবারক আর পরান কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে। কর্তাবাবু তোমাদের কিছু জমি দেবেন।

কি আওয়াজ রে বাবা, তোমার ইলেকট্রিক গীটার ফেল। বুঝলে, বলল পার্ষদ। ঠিকই, এত আওয়াজ কান ফেটে যাওয়ার যোগাড়। আগে তো আর মাইক ছিল না, বললেন প্রধান। দূর থেকেও লোকে যাতে শুনতে পারে এই চিন্তাটা মাথায় রেখে এমন তীব্র আওয়াজের বাঁশী বের করা সোজা কথা নয়। এর আবিষ্কারক কে জানিনা, তবে তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। শ্রবণ মাথা নীচু করে শুনছিল। আবেশে চোখ দুটো বোজা। মাঝে মাঝে পুলকে আহা হা করে উঠছিল। সেই বোজা চোখের ভেতর বাল্যের স্মৃতি। সেও এমনি সোনা ঝরা শরৎ সকাল, টল টলে পরিষ্কার জলে টই টম্বুর পুকুর, শিউলীতলা, অজস্র কমলা রংয়ের বোটা পরা সাদা ফুল –, মৃদু গন্ধ, গুলঞ্চ লতায় মালা গাঁথা, দুরন্ত কৈশোর। আর পুজো মন্ডপ হতে ভেসে আসা সানাইতে আশাবরী। অপূর্ব! থামল সানাইদার।

পার্ষদ বলল, –বাবা, কি আওয়াজ! কান একেবারে ঝালাপালা।

সিগারেট অভ্যেস আছে? বলল প্রধান।

সানাইদার একগাল হেসে ঘাড় নাড়লো, গালে দাঁত নেই, দন্ত কৌমুদী বিকশিত না হলেও হাসিটা ভাল লাগলো সকলের।

ওদিকের দল, সরে পড়েছে। এই পরিবেশ তাদের কাছে ঠিক আপন মনে হয়নি। তারা পাশে বসবে, সুখ দুঃখের দু'একটা কথা হবে, বিড়ি ফুকবে সানাইদারকে একটা দিয়ে দেয়াশলাই থেকে কাঠি বের করে ফস্ করে ধরিয়ে দিয়ে বলবে 'টানুন ওস্তাদ', এ সাহেবের দোকানের বিড়ি। সেসব কিছু নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে আর কতক্ষণ শোনা যায়। তাই তারা আর সানাই থামার পরে দাঁড়ায়নি। ন্যাংটা ছেলেরাও চলে গেছে।

সিগারেট অর্ধেকটা খেয়ে নিভিয়ে ফেলে, সানাইদার আবার সানাই তুলে নিতেই প্রধান বললেন –থাক আর সানাই বাজিয়ে কাজ নেই, ভারি তীক্ষ্ম আওয়াজ। কানের পর্দা আর থাকে না। তাতে অপ্রতিভ হল না কিন্তু ও, বলল –তাহলি গান শোনাই?

গান! মনে মনে ভাবলো প্রধান এই বয়সে? প্রকাশ্যে বলল –আচ্ছা কত বয়স হল?

তা হয়েছে। তিন কুড়ি পোনারো টোনারো।

এতক্ষণ শ্রবণ কিছু বলেনি, স্মৃতির সৌরভ রোমন্থন করছিল বোধ হয়। এবার আড়মোড়া ভেঙ্গে একটু এগিয়ে এসে বলল, –বেশ গানই হোক, –তবে বড় তালের গান হবে কিন্তু।

কি তাল শোনবেন? সানাইদার প্রশ্ন করে –চৌতাল, একতাল, তেওট যা বলেন। ধামার! জান? প্রশ্ন প্রধানের।

ধামার? চোদ্দ মাত্রা। জানি, বলেই মুখে বোল বলতে শুরু করে দিল। ক ধে টে ধে টে ধা আ গ দি নে দি নে তা আ।

বেশ ধামার দিয়েই শুরু হোক। বলল শ্রবণ।

গান শুরু হয়ে গেল, একের পর একটা। ধামার, চৌতাল, তেওট, একতাল, কাওয়ালী দম রাখা কঠিন, তবুও গলায় জোর আছে। আগে এইভাবে গলা তৈরী করতে হতো। আজকাল যেমন মাইকে মোলায়েম করে মৃদু স্বরে গান গাইবার রেওয়াজ। আগে তেমন গলার গান কেউ শুনতো না, ভালও বাসতো না। পার্ষদ সিগারেট টানছিল, বড় একটা টান দিয়ে –বেশ বাঁকাভাবেই কথাটা বললে .....।

কি নাম তোমার?

মোবারক।

মোবারক?

জ্বি।

জাতে মোছলমান?

আচ্ছা মোছলমানদের গান টান জান কিছু? গাইলে তো সব হিন্দুদের গান।

খোঁচা খেয়ে সানাইদার অপ্রতিভ হল না। বলল –বিদ্যের আবার হিন্দু মোছলমান কি?

ইসলামী গানের কথা বলতিছেন? তাও গাতি পারি। শোনবেন?

প্রধান বললেন-না থাক্, অনেক বেলা হয়ে গেল। আর এক রাউন্ড বরং চা বলা যাক্। তারপর শ্রবণের দিকে ফিরে বললেন, কেমন মনে হল। শ্রবণ বলল, পয়সা থাকলে ওর কাছে কিছুদিন তালিম নিতাম। এত বড় বড় তালের গান আমিও জানিনে। প্রধান চুপ করে ভাবতে লাগলেন, পার্ষদ চিৎকার করে জালালকে ডাক দিয়ে বলল –এই জালাল আর এক রাউন্ড চা-র কথা শুনেছিস্। দূর থেকে জালালের উত্তর ভেসে এল –এই তো হয়ে গেলো। আনছি।

খানিকটা চিন্তা করে প্রধান বললেন –রোজ কত পাও সানাই বাজিয়ে?

তার ঠিক নেই কোন। আট টাকাও হয়, আবার দশ টাকাও হয়। তবে খাওয়াটা এক রকম করে হয়ে যায়।

ভক্তদাসকে পাটিতে বসতে বলা হয়েছিল। ও ওস্তাদের পাশে বসেছে। নির্বাক শ্রোতা ছাড়া আর কিছু সে বলেনি, এইবার ওস্তাদকে বলল– চলুন ওস্তাদ।

–––সমাপ্ত–––